ARCHIVE এবং
JULY 2014

জুলাই ১, ২০১৪

বহু গবেষণার পর গোটা কুড়ি ধোপার খাতা ও শখানেক পেনসিলের ঘর্ষণে অবশেষে একটি ট্যাক্সোনমি বানানো গেল। পাঠকেরা মিলিয়ে নেবেন।
১. কবি আঁতেল - এরা আঁতেল হতে চায়, আসলে নয়। শুরুর খানিক বার্গম্যান-কুবরিক, অন্তে সৃজিৎ চাই। দাড়ি বাগানো এদের ভিত্তি, অজানা বিষয়ে বেকার গুলতাপ্পি দিয়ে কেরিয়ার নষ্ট করা এদের ভবিষ্যত।
সম্ভাব্য চারণক্ষেত্র- যাদবপুর আর্ট ক্যাম্পাস, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের সামনের রক, ময়দান, শপিং মল, ফেসবুকের আছোলা গ্রুপ।
২. নবী আঁতেল - এরা পড়াশুনা করেন, অনেক বিষয়ে জানেন কথা বললে বোঝা যায়। তবে এঁয়ারা সেয়ানা পাগল গোছের মানুষ (মতান্তরে ফানুশ), কেরিয়ার জলাঞ্জলি দিয়ে সাধারণত কিছু করেন না। বার্গম্যান দেখলে মুগ্ধ হন এবং পৃথিবীর যাবতীয় পপুলিস্ট জিনিসকে(যথা সুপারহিট মুকাবলা, ট্রল পেজ) মনে প্রাণে ঘেন্না করেন, কখনও দয়ার চোখে দেখেন। সমস্যা প্রধানত দুটি, আমি ফিলোজফার গোছের করুণার হাসি এবং

‘আমায় শালা কেউ বুঝলোই না’ গোছের দীর্ঘশ্বাসে কোলবালিশ জড়ানো। সম্ভাব্য চারণক্ষেত্র- যাদবপুর/প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ স্ট্রীটের ভুলে যাওয়া দোকান, কফি হাউস, আইয়াইটি, আইএসাই, মেডিকেল কলেজ।

৩. ভবী আঁতেল- এরা প্রকৃত জনদরদী আঁতেল। নিজেদের পিপলস আর্টিস্ট বলে থাকেন। এরা প্রায় সব কিছুতেই মারকাটারি, পড়াশুনায় তুখোর এবং জ্ঞানসমুদ্র বিশেষ। এরা সমাজ আর সময়ের থেকে এতটাই এগিয়ে থাকেন যে হয় মাদক বা বিপ্লব বেছে নেন এবং ভেঙে টুকরো হয়ে যান। সম্ভাব্য চারণক্ষেত্র- এরা চরেন না, এরা স্রেফ জন্মান।

জুলাই ২, ২০১৪

সারাদিন রোদ্দুরে ঘোরার পর কালীঘাট স্টেশন থেকে যখন মেট্রোয় উঠলাম, দেখি সব সিট তো ভর্তিই, দাঁড়াবার জায়গারও অভাব। কোনমতে ঠেলেঠুলে দাঁড়ালাম ব্যাগটাকে সামনে নিয়ে। সামনে এক বছর চল্লিশের ভদ্রলোক বসে। এসপ্ল্যানেড আসতে তিনি উঠে পড়লেন। স্বস্তির হাসি নিয়ে সবে যখন বসতে যাবো, কনুই দিয়ে ধাক্কা মেরে আমায় সরিয়ে সেখানে বসে পড়লেন আমার পাশে দাঁড়ানো লোকটি। বয়স প্রায় তিনগুণ হওয়ায় কিছু বলা গেল না, কিন্তু আমার সর্বশরীর রি রি করে উঠলো। সিনিয়র সিটিজেন সিট, বসার অধিকার ইত্যাদি অনেক কিছু মাথায় কাঁটার মত বিঁধতে লাগলো। আমি সরে এলাম সামান্য। মেট্রো যখন শ্যামবাজার ছাড়লো, ঠিক তার পাশের জন উঠলেন। এবারও আমি বসার উপক্রম করতেই আরেক বৃদ্ধ একই কায়দায় দখল করে নিলেন জায়গা। আমার তখন কান দিয়ে ধোঁয়া বেরোনোর অবস্থা। দাঁতে দাঁত পিষে চলেছি নিষ্ফল আক্রোশে। শেষ এবং প্রান্তিক স্টেশনে(!!) যখন নামলাম, সমস্ত বৃদ্ধকুলের ওপর আমার শরীর জ্বলছিল ঘেন্নায় আর রাগে। মনে হচ্ছিল এই মুহুর্তে দুনিয়ার সমস্ত বৃদ্ধকে

বাতিল করে দিই পৃথিবী থেকে। মেট্রোর ওঠার আগে ধাক্কা মেরে ফেলে দিই প্ল্যাটফর্মে, দরজা বন্ধ করার সময় চিপে দিই আঙুল। এসক্যালেটরের খাঁজে যেন আটকে যায় ওদের পাম-শু, মরে যাক ওরা, অনেক বেঁচে নিয়েছে, সব্বাই।

পা টেনে টেনে যখন ট্রেন ধরতে এলাম, তখন মেঘ করেছে পশ্চিম আকাশে। দূরে কোথায় যেন একটা ধোঁয়া পাকিয়ে উঠছে। ওটা? ওটাই কি গোধরা? নাকি চৌমাহা? নাকি নিউ ইয়র্ক? এখানে ওখানে জ্বলে উঠছে কিছু মানুষের গনগনে রাগের আগুন। উসকে দিচ্ছে দোষী নয়, গোষ্ঠীকে শেষ করার জন্য। ওইতো ওখানে ধর্ষণের ডাক দিয়ে শ্রোতাদের প্রবল হাততালি কুড়োচ্ছেন জননেতা, কেরোসিন ঢেলে জ্বালিয়ে দিয়ে উৎসব করছে খোলা তলোয়ার হাতে যুবক, কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে নির্দোষকে গুমরোতে দেখে প্রতিশোধের আগুন সেঁকছে উর্দিধারী।

যথাসময়ে ট্রেন আসলে উঠে যাই, ঢুকে যাই ভিতরে, ভয়ে।

আমার থতোমতো শহরের রডোডেনড্রনগুলো অজান্তেই চাপ চাপ রক্ত হয়ে যায়...

জুলাই ৩, ২০১৪

বাঙালি থেকে আড্ডা আলাদা করতেই পারেন কিন্তু আড্ডার থেকে বাঙালি স্বয়ং মনমোহনও পারবেন কিনা সন্দেহ। বাঙালি যে রীতিমত আড্ডাবাজ এবং বাড়াবাড়ি রকমের সাহিত্য উৎসাহী (বই না পড়েই সেই বই সম্পর্কে জ্ঞান দিতে পারে আর কটা জাতি?) তা বাঙালি অধ্যুষিত (অথবা বাঙালির চারণক্ষেতর যাই বলুন) সমস্ত জায়গাতেই অ্যারিস্‌টটলের চাক্ষুষ প্রমাণের ন্যায় ইতিউতি খুঁজে পাবেন। বিঁভুয়ের কলেজে, রুটি মাংস কাঁচা পেঁয়াজ সহযোগে দুরপাল্লার ট্রেনের এর কামরায়, কিংবা স্রেফ কোন রেঁস্তরায় (বারিস্তা থেকে বরিষা) যখনই দেখবেন চার মাথা এক, হাতে গোঁজা বই (গপ্পের স্বার্থে লেখা গুল) থেকে উঁকি মারছে আড়াই টুকরো সাদা চিরকুট, এবং গায়ের জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে টেবিলে খান দুই চাপড় মেরে প্রবলে প্রতিপক্ষকে হয় প্রতিবাদ নয় সম্মতি জানাচ্ছে, নিশ্চিত জানবেন, তারা বাঙালি (কদ্দিন আর ঢপ চালাবেন, ফরাসীরা কাজে মন দিয়েছে বহুদিন) । এ হেন

১৫ নং
বঙ্কিম স্ট্রীট
কলিকাতা -৭৩

সংস্কৃতি মনস্ক (এই বিশেষ বিশেষণটিকে ব্যঙ্গাত্মক বিশেষণের তালিকায় নথিভুক্তর দাবি বহুদিনের) আড্ডাপ্রিয় বাঙালির ঘরে ঘরে নস্যির কৌটো, পানের ডিবের (মতান্তরে, মোবাইলের ইয়ারফোন, সিগারেটের প্যাকেট ইত্যাদি) মত অতিপ্রিয় সাহিত্যের গোড়ায় ধোঁয়া এবং আড্ডা জমানোর তীর্থক্ষেত্রটি ১৫ নং বঙ্কিম স্ট্রীট, কলিঃ ৭৩ এ সাহিত্যকীয় মহিমায় বিরাজমান। "আমাদের সেই তাহার নামটি কফিহাউস"...।

ঊনবিংশের গৌরবে এখনো চকচকে, এখনো চার দেয়ালের ভেতর তর্কের ঝড় ওঠে, আলোচনা -সমালোচনা বাদ যায়না কিচ্ছুটি, পেয়ালায় কফি হয় ঠাণ্ডা, টেবিলে থেকে যায় চল্‌কে পড়া তার দাগ, সার সার টেবিল, চেয়ার,লাল মেঝে, পুরোনো কলকাতার ছবি, সিলিং থেকে ঝুলতে থাকা ঠাকুরদাদা-পাখা, সিঁড়ির কোনায় পানের পিক রঞ্জিত হলদেটে দেয়াল, আর যাঁর মনন-উপস্থিতি ছাড়া বাঙালীর ট্রাফিকলাইট থাকত না, সেই ব্যক্তিত্বটির ফ্রেমবন্দী ছবিটিও হলদেটে দেয়ালে শোভা পেতে থাকে। কফিহাউসের চাক্ষুস আঁতেল দর্শনের পরিসংখ্যান তালিকাটি সিনেমার যেকোনো মার্কামারা বাহান্নবর্তী পরিবারের পৌনে পাঁচ মাসের খাইখরচার লিস্টিকে তুড়িতে ওড়াবে। কলেজ স্ট্রীটের বই

পিপাসু প্রবীণ থেকে রাজনীতি মনস্ক প্রেসিডেন্সিয়ান, দুপুরে সিরিয়ালে অভিনয় করে সন্ধ্যেয় কসবায় ইয়ুথ থিয়েটার চালানো অভিনেতা থেকে দুঁদে সাংবাদিক, নাট্যকার, কবি, লেখক, সাহিত্যিক কিংবা শুধুমাত্র দেখতে আসা জনগণ (ট্যাক্সোনমি এদের কবি-আঁতেল আখ্যা দিয়েছে) এই একটি বিষয়ে সমগোত্রীয়। অতীতের অ্যালবার্ট হলের ভাষণ থেকে দামাল ৭০ কফিহাউস দেখেছে অনেককিছু, দেখেছে শেকলবাঁধা স্বপ্নের মিথ্যে উড়ান, দেখেছে প্রতিভার অকালমৃত্যু। নিখিলেশ, মইদুলরা সুদুর প্যারিস বা ঢাকায় কফি সহযোগে সান্ধ্য আড্ডাটা বেশীরকম মনে করেন হয়ত, আর হয়ত তাই ইঁট প্লাস্টারের নীরব রেঁস্তরাটি পাকাপাকি জায়গা করে নিয়েছে বাংলার ইতিহাসে, বাঙালীর মনে, গানে ,জ্ঞানে , ইসেয় ইসেয়...

জুলাই ৬, ২০১৪

মৃত্যু একটা দারুণ লোভনীয় জিনিস। তার থেকেও চমকদার শোকজ্ঞাপন। এমনিতে সারাদিন ফেসবুকে বসে বিশ্বকাপ ছাড়া তেমন কিছু পোস্টের খোরাক পাওয়া যাচ্ছে না, পেজ অ্যাডমিনরাও প্রবল চিন্তায়। অতএব মৃত্যু চাই, কেউ একজন সহৃদয় গুজব ছড়িয়ে দিলেন নারায়ণ দেবনাথ প্রয়াত। আর পায় কে? পিলপিল করে সব্বার প্রোফাইল থেকে রাশি রাশি শোকসংবাদ বেরোতে লাগলো। হাঁদা-ভোঁদা, নন্টে-ফন্টেদের জন্য যে আমাদের কত্তো ভালোবাসা, তা এক্ষুণি বোঝাতে হবে তো। সব খবর সবার আগে, আমার প্রোফাইলে। আহা-উহুর বন্যা। কেউ একবার খবরটা যাচাই করারও প্রয়োজন মনে করলেন না, খবর পেয়েছি যখন একটা, লে এবার, রিপ লিয়ে যা। আমি কি আর আনকালচার্ড? আমাদের মোটো, পোস্ট করতে হয়, নইলে পিছিয়ে পড়তে হয়।

কিন্তু আমাদের এই প্রবল লোকদেখানো শোকজ্ঞাপনে একটা জলজ্যান্ত লোক দু-দুবার মারা গেলেন আমাদের প্রোফাইলে। একজন অতি উৎসাহী তো উইকিতেও আপডেট দিয়ে দিয়েছিলেন (Beat this!)। অতএব হে অনুভবী নেটিজেন, নারায়ণবাবু বা অন্য যেকোন বিখ্যাত, অখ্যাত মানুষকে অশ্রুজল, দুঃখশোক জানানোর একটু কনফার্ম হয়ে নিন, না হতে পারলে প্লিজ তাঁকে এক নিমেষে মেরে ফেলবেন না।

বুঝলেন?

বুঝলেন না?

'ফের নারায়ণ দেবনাথের নামে ভুয়ো খবর ছড়াবি তো মারব এক থাপ্পড়!'

জুলাই ১০, ২০১৪

এক টাকা, বল?

হেড!

হেড, ডাক!

রাণা,

পাপ্পু,

বাবাই,

লম্বু,

কালী

শিবেন

জয়,

কে বাকি রইলো?

ওঃ তুই? তুই আমাদের, যা গোলকীপার যা।

সেবক সংঘ মাঠের পশ্চিম কোণটায় দাঁড়িয়ে টিম করলো বাবুল আর সুনীল। আমাদের

পাড়া টিমের সেরা দুজন প্লেয়ার। যেহেতু প্রথম দুদিন গাঁই গুঁই করে উঠে খেলেছিলাম আর একটা বলও ঠিকঠাক পায়ে লাগাতে পারিনি, তাই তৃতীয় দিন থেকে আমি ইউনিভার্সাল গোলকি। প্রথমে একটু চোখ ছলছল, কাঁপা কাঁপা ঠোঁট, অস্ফুট অশ্লীলতা, তারপর মুখ গুঁজে দাঁড়িয়ে পড়া বাবুলের ছ-নম্বর চটির মাপে বানানো সাত পা গোলপোস্টে। আমাদের টিম ভালো হয়েছে, তাই এক কোণে দাঁড়িয়ে দুব্বো চিবুচ্ছি। আমার বিশেষ কোন কাজ নেই। সব্বাই যখন দৌড়ে দৌড়ে হাল্লাক, 'এদিকে দে', 'এই দ্যাখ', 'ফার্স্ট টাইম দে', 'শটটা নে, ফাঁকা ফাঁকা' এইসব কথা চালাচালি, আমার সাথে শুধু একটাই কথোপকথন, 'টাচটা দে।' দু-একবার শট নিয়ে দেখেছি, আমাদের টিমের কারুর কাছে যাবেই না বলটা। তাই আমি টাচ দিয়ে যাই। বল নিয়ে উঠে যায় বাবুল। মাঝে মাঝে বল আসেও, আমি আনাড়ির মত ছুটে যাই সামনে। জানি শট মারলে বুঝতেই পারবো না কোনদিকে, যা ক্যাবলা আমি। যদি সামনে এগিয়ে আমার পাহাড়প্রমাণ শরীরে আটকে যায় বলটা। আটকে যায়ও কোন কোন সময়। নিজেই নিজেকে বাহবা দি, 'বাঃ, খেলা শিখছিস বুঝলি, তোর হবে।' ডিফেণ্ডার শিবেনের কাছ

থেকে ক্কচিৎ 'গুড সেভ।' আবার বলটা গলেও যায় কখনো বা। আধলা ইঁট দুটোর মাঝখান দিয়ে। আমি হাঁ করে দেখতে থাকি। কিভাবে বুঝবো আমি ও বাঁদিকে মারবে! কোন কায়দায়? কে শেখাবে? বলটা কুড়িয়ে এনে টাচ দিই আমি আবার, টাচ দিয়ে যাই। সন্ধ্যা হয়ে আসে, কাদায় মাখামাখি তখন সব্বার প্যান্ট। শুধু আমার বাদে, দৌড়াইনি যে। ছিটে ছিটে কিছু দাগ, আবছা আলোয় যেন কুচি হিরে মনে হয় সেগুলো। আমি যে খেলেছি, খেলায় না থেকেও খেলা, এই যে মণিমুক্তো ঘাম। পড়তে বসে বারবার মন চলে যায় সেবক সঙ্ঘের মাঠে। দাদার কেডসটা যদি পরে যাই কাল থেকে? তবে কি পারবো? পারবো মনে হয়। আর, আর মায়ের কাছে খুব ঝুলোঝুলি করে একটা অ্যাংকলেট। আর, আর একটা নিক্যাপ যদি। ঠিক, ঠিক রুখে দেব কাল। সুনীলের পায়ের সামনে পর্বত হয়ে দাঁড়িয়ে যাব, ভয় পাইয়ে দেব, এই ক্যাবলাচণ্ডী। রাণার বাঁ পায়ের শট গুলো ঠিক আন্দাজ করে ডানদিকে ডাইভ মারবো। মাছি গলতে দেব না। একবার, একবার শট নেবো ঠিক। বাবুলকে বললে কি আর দেবে না একবার! আকাশছোঁয়া শট নেবো, লম্বু বুক দিয়ে নেবে। তারপর কালী, তারপর বাবুল, আবার

লম্বু, বাবুলের হেড, গো-ও-ও-ও-ল। সবাই নাচতে নাচতে এগিয়ে আসবে আমার দিকে। একবার করে সব্বাই হাত মেলাবে।
বাবুল কাঁধটা চাপড়ে দিয়ে বলবে, 'জিয়ো, আজ তোর জন্যই ম্যাচটা জিতলাম।'

জুলাই ১২, ২০১৪

জন্ম থেকেই আমাদের কপাল যে পোড়া তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি, ব্লগে লোক লাইকায় আমরাও লিখে যাই... কানা, খোঁড়া কোন রকমের পয়সাই কেউ ঠ্যাকায় না, ইদিকে বিষয় খুঁজতে অ্যাডমিনদের মাথা চুলকে টাক, বিপি আকাশ ছুঁয়েছে সেই মুহূর্তে জানা গেল আমাদের বানানো একমাত্তর ফিচার ফিলিমের পোস্টার পরিচালকের পসন্দ, হাড়ে বাতাস লাগলো... কিন্তু ওই যে বল্লুম না পোড়া কপাল, সেই ছবি আজ পর্যন্ত বেরুল না।

জুলাই ১২, ২০১৪

'কত কষ্ট করে যে সহজে লিখি তা জানবে কি করে?'
বার্লিনের বড় রাস্তা কুরফুর্স্টেন-ডাম যেখানে উলান্ড-স্ট্রাসের সঙ্গে মিশেছে, সেখানেই দু-তিনটে বাড়ি পর 'হিন্দুস্তান হৌস।' তার এক কোণে বসে আছেন চাচা, তাকে ঘিরে জনাপাঁচেক আড্ডাবাজ, আর আলিসাহেব। আড্ডা শুরু হয় জর্মনির আদব-কায়দা নিয়ে। সুতো ধরে ধরে আড্ডা চলে যায় প্যারিসে। প্যারিসের ল্যান্ডলেডির সাথে বাঙালীর মিল খুঁজে দেন আলিসাহেব। ফ্রেঞ্চের রোম্যান্টিসিজম একধাক্কায় নিয়ে যান পেশাওয়ারে। পাঠানের দরাজ দিল, আবদুর রহমানের পাগড়ি, খাইবার পাস বয়ে চলে আসে কলকাতায়। কলকাতা থেকে সেই সুতো ছুট লাগায় শান্তিনিকেতনের লালমাটিতে। কোথায় যেন ভাষা-ধর্মের শেকলটা খুলে পড়ে যায় মাটিতে। ইলিশ মাছ, জর্মন বিয়ার আর কাবুলের ফালুদার স্বাদ ছুঁয়ে যায় আমাদের ঠোঁট। ফরাসী কবিতা, গালিবের শায়রী হাত মেলায় রবিঠাকুরের সঙ্গে। আলিসাহেবের মুখে খই ফোটে। আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। একঘেয়ে সন্ধ্যেটা আলোকিত হয়, গনগনে দুপুরটা ঝাপসা হয়ে যায়, আরবী-ফারসী

মুজতবা

শব্দগুলো লিখতে ইচ্ছে করে, বলতে ভালো লাগে।
সন্ধ্যে গড়ালে বার্লিনের রেঁস্তরা থেকে ফিরে আসি নিজের চিরচেনা ঠেকে। গোটা পৃথিবীর দিকে আমার জানলাটা খুলে দেন আলিসাহেব, যাঁর কেতাবি নাম সৈয়দ মুজতবা আলি।

জুলাই ১৪, ২০১৪

যার নাম -জর্মান
অভিবাদন।

জুলাই ১৬, ২০১৪

ভাগ্যিস গাজা স্ট্রিপ নিয়ে তুমুল বাওয়াল চলছে।
নইলে ওয়ার্ল্ড কাপের পর স্ট্যাটাস আপডেট দেওয়ার
টপিক কোথায় পেতাম?

জুলাই ১৭, ২০১৪

কিছু ক্ষেত্রে সময়ের ওপরে নিজেকে ছেড়ে দেওয়াটাই একমাত্র পথ হয়ে দাঁড়ায়। কোথায় ভাবলাম এই ফুটবল বিশ্বকাপটা শেষ হওয়ার পর কাজে মন দেব, বসের কথাটা লক্ষ্মী ছেলের মতো শুনব, গোল্ড ফ্লেক পুড়িয়ে Pollution বাড়ানোটা বন্ধ করব, তা না, চলে এলেন মহান রাবিন্দ্র। না না ঠাকুর নয়, জাদেজা, কি হয়েছে ভাই? একটু না হয় ঠেলা দিয়েছে আন্দারসান। ওরে ফুটবল দেখে তোরা কি কিছুই শিখলি না রে? বেশ করে এখুন একটু কাদা ছোড়াছুড়ি কর, তবে যদি তোদের শান্তি হয়। আর ওই ব্রিটিশগুলো তো আরও বড় কুচুটে, ঘিলু খাটিয়ে বের করলাম, শেষ একবছরে ওদের মতো বাঁদরামো ক্রিকেট মাঠে কেউ করেনি। সরি, আপনারা আবার Disciplined জাতি, কত কি জানেন, মাফ করে দেবেন আপনাদের নামটা টেনে আনলাম বলে, কোথাকার কোন ‘নিগার’, তার এত বড় স্পর্ধা? দিলাম, ছেড়ে দিলাম নিজেকে, আর পারলাম না ধরে রাখতে, লক্ষ্মী ছেলেটি আর হওয়া গেল না, আবার সেই কাজের সময় ফাইল রেখে তর্ক শুরু করলাম, গাভাস্কারকে কবে কে ‘শালা’ বলেছে থেকে শুরু করে

সচিন কবে গালি খেয়েও দেঁতো হাসি বন্ধ করেনি সেই অবধি।।ধুস, আবার সেই রাত জেগে খেলা দেখা, আবার সেই অফিসে বসে ঢুলুনি।
বাঙালী তোমার আড্ডাটাই আমাকে ভাতে মেরে দিল গো...।

জুলাই ১৮, ২০১৪

স্টিলের তৈরী বডি, নিচে সরু সরু দুটো পাইপ বেরিয়ে এসেছে। ওপরটা সোনালী, নিচটা সবুজ কিংবা লাল, সঙ্গে একটা ছোট্ট চামচে আর ড্রপার। ড্রপারটা পাইপের ভেতরে একটুখানি জল ভরার জন্য। চামচেটার মধ্যে রাখা তেল দেওয়া তুলো বা পলতেয় আগুন দিয়ে ঢুকিয়ে দিতে হত ভেতরে। তারপর একটা গামলায় সেটাকে ছেড়ে দেওয়া। ওমনি তরতর করে এগিয়ে যেত আমার নৌকো। গোল গোল করে ঘুরতে থাকত অনর্গল।এই চিজ পাওয়া যেত রথের মেলায়, দাম দশ টাকা। সকাল থেকে উত্যক্ত না করলে আর পাঁপড়ভাজার বায়না না করলে ওই জিনিসটি পাওয়া খুব একটা কঠিন ছিল না। কি অদ্ভূত খেলনা, নিজে নিজে চলে। তখনও রিমোট কন্ট্রোল এই মফঃস্বলে আসেনি। শুধু কোন একটা বিদেশী সিনেমায় দেখেছি সেরকম নৌকো, তার আবার রেসও হয় লেকে। আমাদের নৌকো বলতে তখন ইতিহাস খাতার ছেঁড়া পাতার অরিগ্যামি। সেই অযান্ত্রিক ছোটবেলায় আমাদের অটোমেটিক চিনিয়েছিল ছোট্ট নৌকা। বাথরুম থেকে মাঝারি গামলা, বাবার পকেট দেখে দেশলাই, ঠাম্মির ঘর থেকে পলতে আর রান্নাঘর থেকে তেল আনলেই হাঁক, 'All aboard.' গামলার মহাসমুদ্রে তখন আমিই ক্যাপ্টেন। যত বড়

গামলা, তত বেশী মজা। ভট ভট শব্দে চরকিপাক খেত আমার ভটভটি যতক্ষণ না তেল ফুরোচ্ছে।
আজকের রিমোট কন্ট্রোল গাড়ি, প্লেন, জাহাজের দুনিয়ায় অনেক পিছনে চলে গেছে ভটভটি। কত সুদৃশ্য সেই সব খেলনা, কত কায়দাকানুন। ক্রমশ ছোট হতে থাকা রথের মেলাটায় দোকানটাও দেখি না আর। হয়তো তার জংধরা বডি নিয়ে সে পাড়ি জমিয়েছে অন্য ছেলেবেলায়, খুলে দিয়েছে লুকোনো পাল, গোল পৃথিবীটার এক কোণ থেকে যাত্রা শুরু করেছে সন্ধ্যের আগে। ভট ভট শব্দে হেলেদুলে দূরে চলে যায় আমাদের আদরের নৌকা... জানি চরকিপাক খেয়ে ঠিক ফিরে ফিরে আসবেই সে, আগুন শেষ হবার আগেই।

জুলাই ১৯, ২০১৪

সাদা কাগজে মোড়া বইটা পরে ছিল টেবিলের এক কোণে, কি ওটা? ভাগ্যে আমার মগজটা বেশ সাফ তাই ধাঁ করে মনে পড়ে গেল ওটা কাল আনন্দমেলা সকালের ডাকে এসেছে, পূজাবার্ষিকী। চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে হাতে তুলে নিলাম, ওজনে একটু বেড়েছে কি? মোড়ক না খুলেই হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম বেশ কিছুক্ষণ, আশঙ্কা আর উত্তেজনা নিয়ে। জানি মৃতদেহ হাতে দাঁড়িয়ে আছি, সাদা মোড়কটাও যেন অশুভ ইঙ্গিত বহন করছে... কিন্তু, কিন্তু হতেও তো পারে... আমি খারাপটাই ভাবছি কেন। নিজেকেই ধমক দিলাম, "কি হচ্ছে কি?! খুলে ফ্যাল মোড়কটা" নিজেকে উপেক্ষা করা কঠিন, খুললাম মোড়ক... ফ্যাকাসে মুখ দেখে মনটা দমে গেছিল... তাও, তাও খুলে ফেললাম বইটা, চেনা নাম খুঁজতে লাগলাম, কৃষ্ণেন্দু চাকী, উদয় দেব, যুধাজিৎ... জানি পাব না... তাও রূপক সাহাকেও খুঁজলাম বারবার... নেই। নতুন প্রায় সব্বাই... পড়ার চেষ্টা করলাম একটা গল্প, মন টানল না... বড় ফরমায়েসি লেখা। সূচিপত্র মিলিয়ে ফেলুদা খুলে অভিজিৎ বাবুকে খুঁজলাম আবার... পেলাম না। পড়ার মত মনের জোর পাচ্ছিলাম না আর ,পাতা উল্টে ছবি দেখতে দেখতে

বুঝলাম সমীর সরকার মৃত এই ধাক্কাটা আজও সামলে উঠতে পারিনি, বন্ধ করলাম বইটা। চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, ইচ্ছেও করল আর বানাতে, পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলার মৃতদেহ কোলে নিয়ে বসে রইলাম...

জুলাই ২১, ২০১৪

সময়টা ছিল আজহারউদ্দিন, সচিন সৌরভের দাপটের, যখন নিয়মিত মাঠে যাওয়া আর ফেরার পথে পুকুরে (তখনও খানকয়েক ছিল কলকেতায়) আমোদের ডুব দেওয়াটা বংশপরম্পরায় বজায় না রাখতে পারলে সন্ধ্যার বরাদ্দ তেলেভাজা মুড়ি মিইয়ে পান্‌সে ঠেকত, আর পড়াটা এগোত তৎকালীন সরকারের দেশোন্নতির থেকেও জঘন্য হারে ,বইয়ের পাতায় লাইন কে লাইন পেন্সিল বোলানোই হত সার। আর তারপরেই মাঠে পড়ল 'ভারত' কোম্পানির ইঁট আর আমাদের বুকে লক্ষণশেল (শেঠ নয়), অগত্যা মাঠ উঠে এলো ছাদে, শুরু হল ছাদ-সংস্কৃতি। কান গলা নাক চোখের মত ছাদ বিশেষজ্ঞও থাকত মজুত, কাঠবুড়োর ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে বুঝিয়ে দিত ছাদের রকমফের, ফুটবলে লাথি মারার একরকম ছাদ, কলোনি আর উত্তর কলকাতার তালঢ্যাঙ্গা বড় ছাদওয়ালা বাড়িগুলো এই দলের মেম্বার; ছাদের কোনায় কুমড়োর ছোটো মাচা বনল তেকাঠি, তাতে বল পড়লেই সমবেত স্বরে ‘গোল!’ দুপুরবেলা লুকিয়ে ভাত নিয়ে ছাদে ওঠার মানেই ছিল ছেঁড়া ঘুড়ি মেরামত। ঘুড়ির ক্ষেত্রে আবার উঁচু, আশেপাশে গাছহীন বাড়ির কদর ছিল। ক্রিকেটের জন্য আবার খোঁজ পড়ত উঁচু পাঁচিলওয়ালা ছাদের। কাপড়

মেলার দড়িটায় মোজা ঝুলিয়ে বল ঢুকিয়ে চলত শ্যাডো, পরেরদিন একবারও বল ছাদের পাঁচিল না টপকালে জুটত 'পিচে'ই শুকোতে দেওয়া আচার বা মোরব্বার টুকরো, ওইটেই আমাদের ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পেরাইজ মানি। মাঠ হাতছাড়ায় ছাদের যে শুধু কদর বেড়েছিল তাই নয়, ছাদ হয়ে উঠেছিল দৈনন্দিনের রুটিন জীবনের রীতিমত অপরিহার্য স্বাধীনতা। সেখানেই পায়রার খোপ, পাখির ঘর, কাঠের বাক্সে খড় গুঁজে গিনিপিগের আস্তানা (সেটাই যে আমাদের পক্ষিরাজের আস্তাবল সে জানতুম কেবল আমি আর পটল)। চিলেকোঠার ঘরে ফেলে দেওয়া জিনিসপত্তরের একছত্র আধিপত্য। কালীপুজোয় বোতল যোগাড় করে তাতে রকেট পুরে সলতেয় আগুন দেবার মজা চিলের ছাদ ছাড়া আর কোথাও ছিল না। ছাদ অবিশ্যি এখনও আছে, গা ঘেঁষাঘেঁষিতে আর কোনো বাড়ি নেই। কেমন এঁটো থালা বা ক্যাপ্টেনহীন জাহাজের মত, একাকী। উঁচু বুক সমান পাঁচিলে লাগানো লাইট আছে, চারধারে বাহারী গাছও আছে , নেই শুধু আমাদের ৯ বলের এক ওভার, নেই নিকোনো উঠোনের মত তক্‌তকে মেঝেতে কিত্ কিত্ বা বুড়ি কাটবার দাগ। আমাদের শৈশব, সেটা চাপা পড়ে গেছে ফ্ল্যাট সংস্কৃতির বহু নীচে, ছেলেবেলায় বুক অফ নলেজে ছবি দেখা পম্পেইর মতই।

জুলাই ২১, ২০১৪

'অ বাপ, তুমি বীণাপাণির পোলা? কও না? আমার বইন বীণাপাণি? অ বাপ, কও না?' আমার বাবাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে চলেছেন এক শীর্ণ বৃদ্ধা। তার কুঁজো হয়ে যাওয়া শরীর থরথর করে কাঁপছে, লাঠিটা পড়ে রয়েছে আলের ধারে। কুঁচকে যাওয়া চামড়ার দুটো হাত হারিয়ে গেছে বাবার কাঁচাপাকা চুলে। তার পরনে সাদা শাড়ি, মাথার চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা। তাকে দেখতে অনেকটা আমার ঠাম্মির মতই, ছ-মাস হল যাকে আমি আর বাড়িতে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না।

জায়গাটার নাম নরসিংদি, ঢাকা থেকে ঘন্টাদেড়েকের পথ। হলুদ হয়ে যাওয়া একটা কাগজে লেখা ঠিকানাকে সম্বল করে আমরা এসেছি আমার ঠাম্মির একমাত্র দিদিকে খুঁজতে। পঞ্চাশ বছর আগে পুণ্যিপুকুর, মাঘমণ্ডল, গাদি, খো-খো খেলা সদ্য কৈশোর পেরোনো দুই বোনের হাতদুটো আলাদা হয়ে গিয়েছিল। কলকেতায় বিয়ে-থা হয়ে আর ফিরে হয়ে যাওয়া হল না ছেলেবেলার গ্রামটায়। মাঝখানে কেউ একজন শক্ত লোহা দিয়ে বানিয়ে দিল কাঁটাতার, কাউকে জিজ্ঞেস না করেই। তখন আমার রাজনীতি বোঝার

সময় হয়নি, আজও বুঝি না তেমন। সেদিন আমি শুধু বুঝেছিলাম রক্তের জোর কাকে বলে।

প্রণামের পর্ব শুরু হয়, বাবার শরীর ছুঁয়ে থাকেন আমার সদ্য খুঁজে পাওয়া ঠাম্মি। খুব চেনা লাগে অচেনা দেশের এই গ্রামটা। দূরে পুকুরপাড়ে বসে কে যেন গান গায়, ‘মন আমার পাগলা ঘোড়া রে, কই ক্ষণে কই লইয়া যায়।’

জুলাই ২১, ২০১৪

ধর্মতলায় আসেনি, এসে হয়ত যাবে কদিনের মধ্যেই ,বাজার গরম থাকতে থাকতেই ,বেছেবুছে একখানা কিনে ফেলা দরকার। ল্যাপটপ আর স্মার্ট ফোনের ওয়ালপেপার তো বদলে দিয়েছি আগেই, ফেবুও বাদ যায়নি , হুম্মমম, আমি কি আন-সোশ্যাল নাকি ?

জুলাই ২৩, ২০১৪

'আচ্ছা বাবু, তুমি কাকে বেশী ভালোবাসো? বাবা না মা?'
সদ্য কথা বলতে শেখা শিশুটি দাঁড়িয়ে রয়েছে কাঠগড়ায়, চারিদিকে অনেক অচেনা মানুষ। এমন প্রশ্ন করছে যার উত্তর তাঁর জানা নেই। (প্রশ্নকর্তারও কি আছে?) সঙ্গে কানের পাশ দিয়ে ঘাম, কাঁপা কাঁপা লাল ঠোঁট, কি উত্তর দেবে সে এই কঠিন প্রশ্নটার?
না, জায়গাটা কোন কোর্টরুম চত্বর নয়, ডিভোর্সের মামলার শুনানি নয়, নেহাতই মামুলি একটি ফ্যামিলি গেট টুগেদার। কোন স্বচ্ছ ছোট্ট মাথার মানুষ দেখলেই আমাদের মনে কিলবিল করে উঠতে থাকে নিপীড়নের নানা তরিকা। উদ্দেশ্য, কিভাবে ওই কচিটাকে প্রবল অপ্রস্তুতে ফেলে দেওয়া যায়? Rhetorical প্রশ্ন করে? নাকি চোখ পাকাবো শুধু শুধু যাতে ও ভয় পায়? নাকি ভ্যাংচাবো যাতে ও খুব খুব রেগে যায়? আচ্ছা যদি এটা বলি যে 'তোর মাকে আজ এখানে রেখে দেব হ্যাঁ? তুই বাবার সঙ্গে বাড়ি চলে যা।' এটা বললে নিশ্চয়ই খুব দুঃখ পাবে পুঁচকেটা। ঠোঁটগুলো ফুলে উঠবে, চোখদুটো সরু সরু হয়ে যাবে, বুঝতে পারবে এই দুনিয়াটা আসলে তাকে ভ্যাঙাবার জন্য, কষ্ট দেবার জন্য, একা করে দেওয়ার জন্য তৈরী হয়েছে, প্রত্যেকটা মানুষ ওত পেতে বসে আছে কখন

ভিজিয়ে দেবে তার গাল। এইত্তো চাই, এই প্রবল কান্না কান্না মুহূর্তটার জন্যই তো অপেক্ষা, এই তো প্রবল মজা, দ্যাক দ্যাক ও কেমন ভয় পায়, হে হে হে হে হে, কি মজা! ঠিক সেই মুহূর্তটায় আমি তাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করবো, সান্ত্বনা দেব, 'না না কাঁদে না', এই সান্ত্বনাতেই তো আমার জিত। দ্যাখ শালা আমি কত্তো স্ট্রং, আর তুই কি?

এসব ভেবে সময় নষ্ট করা খালি, বাচ্চারা তো রয়েছেই আমাদের ননস্টপ এন্টারটেনমেন্টের জন্য। রূঢ় পৃথিবীটাকে তার সামনে ন্যাংটো করে দেব আমি, যাতে জীবনের সবচেয়ে খুশির সময়ে তার সহজ বুদ্ধিতে কোনদিন কিছু ভাবতে না শেখে। তার কান্নায় আমার জিত, তার লজ্জায় আমার ভালো থাকা, তার না-পারায় আমার পারা, এই না হলে লাইফ, উল্লাস বন্ধুরা!

জুলাই ২৪ , ২০১৪

আমার গোয়েন্দা গল্পের প্রতি ভালবাসাটা শুরু হয়েছিল সোনার কেল্লা দেখে, দুষ্টু লোক বলতে একটা শ্রেণীকে বুঝতাম। যাদের জন্য গোয়েন্দাদের এত নাম ডাক। আজ হঠাৎ টিভি খুলে দুষ্টুমি করতে ভুলে গেলাম। ততক্ষণে সেই নিপীড়িত ছোট্ট শিশুটির কান্না দেখে শৈশবকে ভয় পেতে লাগলাম।আজ আবার আরও একটা ছবি দেখলাম সকালের কাগজটায়, গাজার হসপিটালে ভর্তি একটি ১০ বছরের শিশুর ছবি। দুনিয়াটা দাঁড়িয়ে পড়েছে তার সামনে, এক মুহূর্তে তাকে যে অনেকটা বড় হয়ে যেতে হবে, যুদ্ধ করতে হবে, না কোন ইসরায়েলের সাথে নয়... নিজের ভবিষ্যতের সাথে। একটা বোমায় চলে গেছে তার ঘর বাড়ি, বাবা মা। ২ মাস পরেই শারদোৎসব, সেই মেতে উঠবো শপিং এ।ভুলে যাব এদের কথা, সেই মানুষ গুলোর কথা যারা এই মুহূর্তে আমাদের আলসে সময়ের খোরাক হয়ে কিছু আড্ডার যোগান দিচ্ছেন। ইরাক যুদ্ধ, আফঘানিস্থান কে ভুলে গেছি, কারগিল দিবসটাও মনে পড়েনা আর। অনাথ হয়ে যাওয়া কিছু শৈশব, শূন্য হয়ে যাওয়া কিছু মায়ের কোল শুধু পড়ে থাকে এক কাল অধ্যায়ের স্মৃতি বয়ে। তাজ হোটেলের জঙ্গি হানায় মৃত্যু হওয়া সৈনিকদের আর কয়জন মনে রেখে দেয়?

বড় হয়ে গিয়ে দুষ্টু লোকের সংজ্ঞাটা পালটে গেল, এখুন দুষ্টু নিজেকে বলি, কারণটা হয়ত নিজের অক্ষমতা। ফেলুদা, ব্যোমকেশের প্রতিবাদের ভাষাটা ছিল। আমার কি করার আছে? টিভি খুলে নিজেকে বোকা বানানো ছাড়া?

জুলাই ২৬, ২০১৪

মহম্মদ কাসেমের শ্যামাসংগীত + আলেকজান্ডারের মাতলামো = ?

____

Waiting!! Waiting!! Waiting!!

দেব মহানায়ক হওয়ার পরে আমরা শুধুই Waiting, সাড়ে চুয়াত্তর মার্কা ছবি কবে করলে দেব বাবু?? নায়ক না হয় দূরে থাক, তুমি তো এমনিতেই বুনিপ মেরে নায়ক।

আমরাই পাগলু, যাক গে Dance Dance…

জুলাই ২৬, ২০১৪

'পেঁয়াজ আমরা আঁকশি দিয়ে পাড়তে পারি, তাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হবে না। অনেকের ধারণা পেঁয়াজ গাছের ফল, বাস্তবিক কিন্তু তা নয়। বরং ওকে ফুল বলা যাতে পারে। ওর কোন গন্ধ নেই, যা আছে কেবল দুর্গন্ধ। ওর খোসা ছাড়ানো মানেই ওর কোরক ছাড়ানো। এনতার কোরক ওর। পেঁয়াজেরই অপর নাম শতদল।

বাতাবিলেবুর গাছে কমলালেবু ফলাবার সহজ উপায় হচ্ছে এই...' ইত্যাদি ইত্যাদি।

সম্পাদক শিকার করতে গিয়ে শিব্রাম চকরবরতির সম্পাদকীয়ের নমুনা ছিল খানিক এরকমই, ফলে পত্রিকার কাটতি বেড়ে যায় চল্লিশ গুণ। তার নির্ভেজাল স্বীকারোক্তি এটাই তাঁর প্রথম চেষ্টা।

আজ আনন্দবাজারের প্রথম পাতায় প্রথম বার মুখ্যমন্ত্রীর শুয়োর চাষ সম্পর্কে অগাধ জ্ঞানের খবরটা শিব্রামের বেদম হাসির গল্পটাকে যুগোত্তীর্ণ করে দিয়ে গেল।

বলা বাহুল্য, এটাই তাঁর প্রথম চেষ্টা।

জুলাই ২৭, ২০১৪

আমার পোষা টীয়া পাখির নাম মুন্নি। সে চরাই পাখি আর বিরাল দেখলে ঝগড়া করত। কিন্তু আর একটা ছোট বিরাল আছে, সেই বিরালের সংগে ঝগড়া করে না। সে তা খায় সবকিছু নিচে ফেলে দেয়, আর বিরালটা এসে তাই কুরিএ খায়। টীয়া পাখিটা ফুচকা, চানাচুর, বিস-কুট, কমপালেন, চা, পড়োটা খেতে খুব ভালবাশে। কিন্তু চানাচুর আর ফুচকাটা একটু বেসি খেতে ভালবাশে। আর চাউমিং দেখলে ভয় পায়, ভাবে কেচো। বাড়িতে কেও আসলে সে খুব হীংসা করে। ওকে আমি ছোচা বলী, ও আমাকে ছোচা বলে ডাকে। ও আমাকে হীংসা করে। আমি ওর সামনে গেলে কথা বলে না। মুকে ঘুরিএ নেয়। একদীন লক্ষ্মীপুজোর সময় আমার মাশি ওর সামনে দিয়ে সভাইকে প্রশাদ দিছিল। মুন্নি আমার মাশিকে অনেকবার ডেকেছিল, কিন্তু শুনতে পাএ নি। ও খুব চিৎকার করছিল। আমি তার চিৎকার সুনতে পেয়ে তাকে তারাতারি প্রশাদ দীলাম। প্রশাদ খেয়ে সে আমার দীকে তাকিএ হেঁসে ফেলেছিল। তাকে আমি গাএ হাত বুলিএ দিলাম। সে চুপ করে সুয়ে পরেছিল।

না, এটা আমাদের লেখা নয়।
আমাদের বড্ড আফশোষ যে এটা আমাদের লেখা নয়। লেখাটা ক্লাস ফাইভের একটা পুঁচকের।
দুত্তেরি কি যে লিখি সারাদিন আবোল তাবোল, খালি মগজে ঘা দেওয়ার তালে ব্যস্ত থাকি।
হায় রে, যদি এরকম একটা সহজ লেখা লিখতে পারতাম কোনদিন...!

জুলাই ২৮, ২০১৪

মল্লিকবাজারে ফুটপাথের দোকানগুলোতে যখন তেল, নুন, লঙ্কা ছাপিয়ে তৈরী হত সেমাইয়ের পাহাড়, বুঝতে পারতাম ঈদ এসে গিয়েছে। আর তার ঠিক উলটোদিকে বাস থেকে নামলেই পাওয়া যেত বিরিয়ানির সুবাস। এক দিকে দুধ এলাচের দ্রবণে ভাসমান স্বর্গীয় বস্তুবিশেষ, আর জাফরান গোলাপজলের ম-ম-ম-ম-ম গন্ধ, এই দুই পারের নিদারুণ আকর্ষণ উপেক্ষা করে কলেজের দিকে পা বাড়ানো যে কি অতিকায় কষ্ট, তা জানবে কি করে?

তবে ফুর্তির কারণও ছিল, কারণ ফারজানাদের বাড়ির নেমন্তন্ন, পার্ক সার্কাসে। শির খুরমা আর ফালুদা প্রথমবার খাই সেবার। আর কত রকমের পিঠে। আর একটা বড় বড় বিস্কুটের মত জিনিস ছিল, নাম জানিনা ঠিক। কলেজের শেষ বছরটায় কি যে উমদা সোয়াদ ছিল তার। বলেছিলাম, পরের বছর কিন্তু আবার আসবো কাকীমা। পরের বছর ফারজানা চলে গেল দিল্লিতে, ওর খালার বাড়ি। কনট্যাক্টই রইল না আর। ঈদের নেমন্তন্ন তিন বছরের স্মৃতি হয়ে রয়ে গেল চাঁছিপুছি করে খেয়ে ফেলা চিনামাটির বাটিটায়, দোকানের চিকেন রোস্টের নোনতা

স্বাদে। কাকীমা, তুমি কি এখনও সেইরকমই সেমাই বানাও?
অনেকদিন তোমাদের কোন খবর পাই না। ফারজানার বিয়ে হয়ে গেছে বোধ হয়।
কাকীমা, এবার যে আমায় কেউ নেমন্তন্ন করেনি আর। বিরিয়ানি পরিবেশন করার সময় অস্ফুটে বলে দেয়নি, নিশ্চিন্তে খা, এটা 'ওটা' নয়।
পরে জেনেছিলাম ঈদ-উল-ফিতরের নাম 'মীঠি ঈদ'। ঈদ মুবারক তো কথার কথা। বন্ধু, তোর জীবন সেই ফেলে আসা সেমাইয়ের মত মিঠে হোক।

জুলাই ৩০, ২০১৪

কিছুদিন আগে সকাল সকাল বাস এ করে অফিস যাচ্ছি। পা ফেলার জায়গা নেই, কোন মতে নিজেকে একদিকে সেঁধিয়ে দিয়ে কানে হেডফোনটা লাগিয়েছি। রেডিওতে অবোধ্য (হ্যাঁ আমি কোলকাতার বাইরে থাকি) ভাষায় কিছু বলে চলেছেন জকি। কিছুদূর এগিয়ে একটা বড় বাসস্টপ পরে, সেখান থেকে এক অল্প বয়সী তরুণী উঠল। সামনের দিকে এগতে গিয়ে তার সাথে এক পরিচিত ছেলের হটাত দেখা, দুজনের মুখের হাসি দেখেই বুঝতে পারলাম তারা সহকর্মী (রোমান্স অবশ্যই নয়)। আমার মধ্যে লুকিয়ে থাকা সেই বর্বর দানবটা বেরিয়ে এলো দাঁত মুখ খিঁচিয়ে, প্রথম চিন্তা শুরু করলাম প্রেমিক প্রেমিকা কিনা, চোখ ছোট করে খোঁজার চেষ্টা করলাম কপালের ফাঁকে সিঁদুরের টিকাটি।পেলাম না, নিশ্চিন্ত হলাম, আবার তাকালাম দুজনের দিকে। সেই মিষ্টি হেসে গল্প করে যাচ্ছে, আবার মগজের ঘিলু নাড়িয়ে চিন্তায় ডুব দিলাম। পায়ের নখ থেকে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলাম, হ্যাঁ সুন্দরী বটে মহিলাটি। সুন্দর কে কি ভাবে বর্ণনা করব? নিজের মনের জন্তুটার জংলী ভাবটা দিয়ে? নাকি কবিদের মত কবিতা আউড়ে? নাহ, কবিতা পড়ার সময় এটা নয়, এখন মন দিয়ে উপভোগ করে যাও, যদি ছেলেটির সাথে দেখা না

হতো? যদি আমার পাশে এসে দাঁড়াত মেয়েটি? আহা... খাসা হতো।
স্বপ্ন ভঙ্গ হল, অফিস পাড়ায় ঢোকার মুখেই দুজনে নেমে গেল বাস থেকে। আবার সেই দশটা পাঁচটা। শুধু এক ঝলকের জন্য দেখলাম আমার সাথেই বাসের বাকি সবাই মেয়েটির দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে। সবার মনেই কি আমার চিন্তার Play-back চলছিল?
এই ঘটনার দেড় বছর আগে, কোন এক বড়দিন ও নববর্ষের আসরের মাঝখানে। পার্কস্ট্রিটের রাস্তায় হাঁটছি, হাতে মোমবাতি, চোখে বিষাদ, কোন এক নির্ভয়ার জন্য, গণধর্ষণের প্রতিবাদে। নিজেদের ক্ষেত্রে আমাদের এই প্রতিবাদী ভাবমূর্তিটা কোথায় থাকে?
কানে বেজে চলেছে “o baby doll mein sone di” ..

জুলাই ৩১, ২০১৪

“নেই”
(নবারুণ ভট্টাচার্যর প্রয়াণ)